বাংলাদেশে এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি[১]

ড. আবুল বারকাত

আমি মনে করি কোনো একটি বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা বিজ্ঞান সম্মত নয়। তাই আমি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকেও বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিনা। তার মানে হলো যে সামগ্রিকভাবে ১৪০ মিলিয়ন লোকসংখ্যার বর্তমান বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, ত্রিশ বছরের পিছনের একটি মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান এ সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশকে দেখতে হবে। এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে বলার আগে একটি কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। তাহচ্ছে বাংলাদেশে এনজিও'র বিকাশের মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। ৭২ সনের সংবিধানে রাষ্ট্র জনগণকে যা দেবার কথা বলেছিল সেটা রাষ্ট্র দিতে পারেনি। কোনো শূন্যস্থানই যেহেতু খালি থাকে না, সেহেতু সেই ব্যর্থতার শূন্যস্থান পূরণকল্পেই এনজিও'র বিকাশ ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মূল চরিত্রটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। পুরো জিনিসটা আমি এই ফ্রেমের মধ্যেই দেখি এবং আমি মনে করি এটাই ঠিক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এদেশে প্রথম ঘটেছে। এটার মানে সরকারিভাবে এ-পর্যন্ত ২ লক্ষ কোটি টাকা এসেছে ঋণ এবং অনুদান হিসাবে। এই ২ লক্ষ কোটি টাকার ৭৫ ভাগ লুটপাট হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

এই দুর্বৃত্তায়ন ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বছরে ৭০ হাজার কোটি কালো টাকা তৈরী হয়। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কালো টাকা। যে দেশে মোট জাতীয় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ কালো টাকা, সেদেশে স্বাভাবিক ভাবেই এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরী হবে, যেখানে কালো টাকার মালিকেরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবেন। তারাই আবার ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ ঋণ খেলাপী। এরাই বছরে প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার মতো মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত। বছরে ১২-১৫ হাজার কোটি টাকার যে ঘুষ খাওয়া হয় সেখানেও তারাই জড়িত। একইসাথে তারা ১ হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল ও ৫-৭ শত কোটি টাকার মতো গ্যাস বিল ও বকেয়ার সাথে জড়িত। এই গোষ্ঠি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক-বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠান কিনে নিতে ইচ্ছুক পানির দামে। চালানোর জন্য নয়, অন্য কারণে। এরাই আদমজী জুট মিল বন্ধ করেছে। এই যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন হলো, এটাই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের জন্য একটি কার্যকর চাহিদা তৈরী করেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন পুরো মাত্রায় হওয়ার পর একটি সমাজের আর কিছু বাকী থাকার কথা নয়। এই অবস্থায় যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে সেখানে আর যাই থাক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে পারে না। জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না। সেই সংস্কৃতিতে কালো টাকার মালিকেরা ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন এবং যারা ১০ কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচন করে আসছেন, জনগণের কল্যাণের জন্য তারা নির্বাচিত হয়ে আসেননি। নির্বাচনী ব্যয়টা বর্তমানে একটা বিনিয়োগ-এর পর্যায়ে চলে এসেছে। এটা তাদের যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এর চরিত্র সেটাকে ধরে রাখা এবং আরও উন্নততর করার একটি ধাঁধাঁ'র মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশ। সেজন্য আমি বলি যে একটি ফাঁদে পড়েছে বাংলাদেশ, ফাঁদে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংবিধান এবং বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠি ফাঁদে পড়েছে। এই ফাঁদের মধ্যে এনজিও কতটুকু কি করতে পারে এবং বিশেষ করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারে সেটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এনজিওরা অনেকগুলো কাজ করেছে। শিক্ষায় করেছে, স্বাস্থ্যে করেছে, মানবাধিকার, শিশু অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও করেছে এবং দরিদ্র মানুষদের এক ধরনের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ায় তারা অবদান রেখেছে। তবে প্রায়শই দাবি করা হয় যে তাদের অবদানটা বিশাল মাপের। এ ব্যাপারে আমি একমত নই। আমি যদি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির কথা বলি তাহলে বলা যায় যে,

[১] এনজিও বিষয়ক পত্রিকা 'থার্ড সেক্টর'-এ প্রকাশিত , মার্চ, ২০০৪

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি নিয়ে এনজিওগুলো কাজ করছে ২০ বছর ধরে। প্রথমত: ৬৭১ টি এনজিওর কথা বলা হচ্ছে যারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে সরাসরি জড়িত। এই ৬৭১টি এনজিও'র মধ্যে (আমি এখানে গ্রামীণ ব্যাংককেও ধরে নিচ্ছি, যদিও গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও নয় তবুও যেহেতু ক্ষুদ্র ঋণ কমূসূচির কথা বলা হচ্ছে) আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ৬৭১টি এনজিও'র মধ্যে আমার জানামতে ৯০ শতাংশের ওপরে ক্ষুদ্র ঋণ একচেটিয়াভাবে পরিচালনা করে। তাহলে ৬৭১টি এনজিও'র মধ্যে তিনজন একচেটিয়া ব্যবসা করছে। কিন্তু এটাতো হওয়ার কথা নয়। এটা ভালো লক্ষণ না খারাপ লক্ষণ তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করিনা যে এটা কোনো ভালো লক্ষণ। তারা বরাবরই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে। অথচ নিজেরাই ক্ষুদ্র ঋণকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। তা নাহলে মোট রিভলবিং ফান্ডের ৯০ ভাগ তাদের হাতে থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, দাবি করা হচ্ছে যে এই ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র দূরীকরণে বিশাল ভূমিকা রাখছে। আমি এই দাবির সংগে একমত নই। কেননা, বলা হচ্ছে যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী। গত বিশ বছরে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? এখন চৌদ্দ কোটি আছে, অনেকেই মারা গেছে বিশ বছরে। তার মানে গত বিশ বছরে এ পর্যন্ত জনসংখ্যা ২৫ কোটির কম নয়। তাহলে ২৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে তারা সেবা দিয়েছে। এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে কিন্তু আবার একই ব্যাক্তি একাধিকবার গণনার আওতায় এসেছে। কারণ এদের অনেকেই একাধিক এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত আছে। অতএব এটা ২৫ কোটির ১ কোটি ৩০ লক্ষ না বরং ২৫ কোটির ৭৫ লক্ষ। সুতরাং শতকরা হারে এটা খুবই সামান্য একটি অংশ।

আমি মনে করিনা এনজিওগুলো দেখাতে পারবে যে, একজন ভিক্ষুক ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে সে ভিক্ষা বৃত্তি ছেড়ে দারিদ্র সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। প্রথমত, আমরা যদি দারিদ্র সীমার দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে শতকরা ৪৪.৩ ভাগ হচ্ছে দরিদ্র। যার তলায় 'হার্ড কোর' দরিদ্র আছে ২০ শতাংশ। আমার প্রথম কথা হলো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলো 'হার্ড কোর' দরিদ্রের জন্য কিছুই করতে পারেনি। যার বাড়ি নাই, জমি নাই, পঙ্গু, বয়সে বৃদ্ধ, ভিক্ষুক এই যে ২০ ভাগ হত দরিদ্র মানুষ তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আনতে পারেনি। কিন্তু এটা তারা আজ থেকে ৩ বৎসর পূর্বে বলেনি। এটা তারা ইদানিং বলছে। এ ব্যাপারেও আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে যে কেন তারা এখন বলছে। দ্বিতীয়ত, আমার ধারণা ৪৪.৩ শতাংশ যে দরিদ্র জনগোষ্ঠি তাদের কাছেও এনজিওগুলো পৌঁছাতে পারেনি। আমার ধারণা হচ্ছে গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠিকে তারা ঋণের আওতাভুক্ত করতে পেরেছে। ক্ষুদ্রকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়া এবং যে প্রান্তিক অবস্থায় আছে তাকে ক্ষুদ্র পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, এটাও তারা করতে পারেনি। তারা অবস্থানটা একটু ওপরে ওঠাতে পেরেছে এবং সে অবস্থানটা ওপরে উঠে আছে এটা তারা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। একটুখানি ওপরে উঠে আবার নেমে আসে। এই উঠা-নামার মধ্যে তারা রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক গ্রুপের জনগোষ্ঠির জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন কয়েকটা সময়ে খুব বেশি হয়। যেমন ফসল বোনার সময় সার-সেচের জন্য এবং ফসল তোলার আগে। এ সময় তারা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু গরীবরা এ সুবিধাটা নিতে পারেন না। তার একটা বড় কারণ হলো গরীবদের আয় মৌসুম ভিত্তিক। ফসল তোলার সময় বাড়ে, আবার মঙ্গার সময় কমে। কিন্তু যখনই তারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় গেলো তখন ঋণ নেয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এখন সেই সপ্তাহ যদি মঙ্গার সপ্তাহ হয়ে থাকে অর্থাৎ শুরুই করলো মঙ্গা দিয়ে তাহলে কিস্তি শোধ করবে কোথা থেকে? বলা হয়ে থাকে যে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করাটাই হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য। তার মানে তাদের সম্পদ আহরণ ও বৃদ্ধিটা হচ্ছে লক্ষ্য। আমার মনে হয়না মঙ্গার সময় যাদের আপনি ঋণ দিচ্ছেন এবং পরের সপ্তাহে কিস্তি নিচ্ছেন তাদের সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় গরীবের সম্পদ আরও হ্রাস পায়, সম্পদ বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করে। সুতরাং এই গ্রুপকে ঋণের আওতায় আনা আসলেই কঠিন। এটা

এনজিও'রা অতীতে স্বীকার করেনি, ইদানিং করছে। এনজিওদের লোন সিডিউল খুবই কঠিন। সেখানে দরিদ্রদের জন্য নমনীয়তার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক যেখানে সুদের হার কমিয়ে আনছে, সেখানে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ২৫-৬৫ শতাংশের মধ্যে। এটা নিয়ে আমরা অনেক আগে থেকেই কথা বলে আসছি। ইদানিং অন্যরাও বলছে। সুতরাং এটার একটা ফয়সালা হতে হবে।

এনজিও'রা এখন সেকেন্ড জেনারেশন মাইক্রোক্রেডিট-এর কথা বলছে। বিশাল পরিমাণের টাকার কথা বলা হচ্ছে তাদের জন্য, যাদেরকে বলা হচ্ছে হত দরিদ্র (আলট্রা পুওর)। সেখানে কি হবে আমরা কেউ পরিষ্কারভাবে জানিনা। এনজিওরাও পরিষ্কারভাবে বলছে না যে, সেখানে কিস্তি পরিশোধ কি দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে নাকি তারা ঋণ নিয়ে আয় করার পর থেকে কিস্তি চালু হবে এবং প্রকল্প থেকে আয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এই বিষয়গুলো এখনও পরিষ্কার না। যেটা পরিষ্কার সেটা হচ্ছে এনজিওরা বলছে তারা হতদরিদ্রদের কাছে এখনও পৌঁছাতে পারেনি এবং তারা সেখানে পৌঁছাতে চান। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সত্যিকার অর্থে যদি এই হত দরিদ্র (আলট্রা পুওর)-দের কাছে পৌঁছানো না যায় তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার কারণ ২০২০ সনে এই হতদরিদ্র গরীব মানুষের সংখ্যা ৫-৬ কোটিতে পৌঁছে যাবে। অনেকেই একটি বিষয় লক্ষ্য করছেন না যে আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি সফল কর্মসূচি হিসাবে বিবেচিত হলেও গত কয়েক বছরে হতদরিদ্রদের মাঝে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনীদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ এবং গত পাঁচ বছর ধরে একই অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু দরিদ্রদের মধ্যে এটা ৩.২ থেকে ৪.২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ব্যাপক হারে। ২০২০ সাল নাগাদ যদি হতদরিদ্রের সংখ্যা ৫-৬ কোটি হয় তাহলে সেটা নানাভাবে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা তৈরী করবে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ধস নেমে আসবে। অতএব যারা দরিদ্রদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাদের জন্য বর্তমান সময়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক অবস্থা তৈরী করতে চান, এমনকি যারা অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সাথে যুক্ত তাদেরকেও ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে দরিদ্র মানুষদের নিজেদের জন্য যতটা না ভাবতে হবে, যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন টিকিয়ে রাখতে চান তাদের জন্যও ভাবতে হবে। এখানেই ঋণদানকারী এনজিও এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন চক্রের স্বার্থ একত্রিত হয়ে পড়েছে। তারা এটা একসঙ্গে বসেই ঠিক করেছেন কিনা জানিনা।

এনজিও কার্যক্রমের ভালো দিক সম্পর্ক যেটা বলা যায় তাহলো তারা অনেকগুলো বিষয়ে কাজ করেছে এবং যেসব কার্যক্রমের ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে উদাহরণ স্বরূপ দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অন্তর্গত যে ৯০ শতাংশ মহিলা, যেটা বিশ্বব্যাপী প্রচার হচ্ছে, এদের ঋণের টাকা কে ব্যবহার করছে? গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীরা এটা ব্যবহার করছে? কৃষি কাজে ব্যবহার করছে, রিক্সা-ভ্যান ক্রয়ে ব্যবহার করছে ইত্যাদি। সুতরাং ঋণের টাকাটা মহিলারা হস্তান্তর করছেন পুরুষদের কাছে। পুরুষরা আয় করছে এবং তা থেকে ঋণ পরিশোধ করছে। প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই থাকছে। মহিলারা তাহলে কি করছে? তারা সমিতির মিটিং এ গিয়ে কোনো এনজিও'র ১৬ দফা, কারো ১২ দফা, আবার কারো ৮ দফার কথা শুনছে নিয়মিতভাবে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মহিলাদের জ্ঞানের দিকটা কিছুটা ভারী হচ্ছে এবং সেটার একটা ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। যেমন বাচ্চাকে টিকা দিতে হবে , প্রতি বছর গর্ভধারণ করাটা ক্ষতিকর ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যে ক্ষমতায়ন সেটা হচ্ছে না। কারণ টাকার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু বলা হচ্ছে মহিলারা অবদান রাখছে পারিবারিক অর্থনীতিতে। কিন্তু ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই যদি পুরুষরা ঋণের টাকা নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মহিলাদের পারিবারিক অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখার সুযোগ নেই। মহিলারা এখানে রিক্সার মতো একটি বাহন মাত্র। সমিতিতে যাচ্ছে, মিটিং করছে, কিস্তির টাকা জমা দিচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, মহিলাদের মবিলিটি বেড়েছে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন মাপার জন্য মবিলিটি একটি বড় ইনডিকেটর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমি তো জানি যে ফকিরের মবিলিটি ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি।

আপনি যদি ঢাকা শহরের কোনো একটি ট্রাফিক সিগন্যালে একজন ভিক্ষুকের সারাদিনের দৌড়াদৌড়ি হিসাব করেন দেখবেন সে প্রায় ৩০-৪০ কিলোমিটার দৌড়াদৌড়ি করে। এটা হচ্ছে দারিদ্র সৃষ্ট মবিলিটি। দেশের সব মানুষ যদি গরীব হয়ে যায় তাহলেতো দেশের মানুষের মবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং মবিলিটিটা কি কারণে হলো সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সেটা বিশ্লেষণ না করে শুধু মবিলিটিকেই প্রধান করে দেখছি। যেমন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকেই আমরা প্রধান করে দেখছি। কিন্তু এর ব্যবহার কে করছে, কীভাবে করছে সেটা দেখছি না। মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে এলাকাভেদে কি কি করতে পারে সেটাও আমরা খুব একটা জানিনা। সবার জন্য ঢালাওভাবে একই প্রেসক্রিপশন দেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের কোনো প্রকার ইনোভেশন বা নতুনত্ব এখনও দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবার অবকাশ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষেরা আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে প্রশংসা করে। এটা বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ধীরে ধীরে দরিদ্র থেকে উত্তরণ ঘটানো সেটা সম্ভবত হয়নি। তারা নিজেরাই বলছেন যে তারা হতদরিদ্রদেরকে ঋণের আওতায় আনতে পারেননি। আমি বলছি শুধুমাত্র হতদরিদ্র নয় বরং তার ওপরে যে ৪৪.৩ ভাগ দরিদ্র তাদেরকেই আসলে এনজিওরা ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আনতে পারেনি।

ইদানিং অনেকেই বলছেন যে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে। এটা যদি ভালোই না হবে তাহলে অন্যরা অনুসরণ করবে কেন? এক্ষেত্রে আমার উত্তর হচ্ছে যে সব দেশে এটাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সেসব দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি। মাথাপিছু আয় যেখানে ৩-৪ গুণ বেশি সেখানকার যে গরীব মানুষ আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চাষীর লেভেলে রয়েছে। সুতরাং আমাদের এখানে যেহেতু ক্ষুদ্র চাষীর জন্য কাজ করছে, তাহলে অন্য দেশের ঐ গরীবদের জন্য কাজ করবে। সেখানকার হতদরিদ্র কিংবা ভিক্ষুক তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কোনো কাজ করছে কিনা সেটা দেখার বিষয়। আমি মনে করিনা তাদের জীবনে ক্ষুদ্র ঋণ কোনো অবদান রাখতে পারছে। অতএব এই যুক্তিটা খুব বেশি শক্তিশালী নয় যে অন্য দেশে যেহেতু ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র দূরীকরণে কাজ করছে তাহলে আমাদের দেশে কেন করবে না।

বাংলাদেশের সামগ্রিক যে চিত্র সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে আরও ঢেলে সাজালে কার্যকরী হতে পারে কিনা এটা একটা প্রশ্ন। আমি মনে করি পারে না। কারণ হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মোট সংখ্যা হচ্ছে ৭-৮ কোটি। সেখানে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ এবং অবশিষ্ট যে দরিদ্র জনগোষ্ঠি রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছাতে হলে কত বড় আকারের একটা ঋণ কর্মসূচি হতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। এত বড় একটি ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করার যোগ্যতা ৬৭১টি এনজিও মিলেও হবে না। এটা পারে কেবল রাষ্ট্র। এনজিও'রা যেটা পারে সেটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রুপের দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন রকম মডেল তৈরী করতে পারে এবং বিভিন্ন রকম মডেল পাইলটিং করতে পারে। এখানে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। রাষ্ট্র যদি না পারে তাহলে সংবিধান থেকে ঐ জায়গায়গুলোকে মুছে ফেলতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনো কিছু থাকার কথা নয়।

ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চ সুদের হারকে জায়েজ করার জন্য যারা বলছেন যে পৃথিবীর অন্য দেশে সুদের হার এরচেয়েও বেশি তাদের এই ধারণাটি যুক্তিসংগত নয়। কারণ অন্যান্য দেশে মানুষের জীবনমান অনেক উঁচু। সুতরাং সেখানে বেশি হতেই পারে। সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের যে হিসাব সেটাও ঠিক নয়। কারণ আপনি তিন বৎসর মেয়াদী একটি ব্যাংক ঋণের সুদের হিসাবের সাথে যদি এনজিও'র একটি ঋণের সুদের হিসাব তুলনা করেন তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসলে সরল ও চক্রবৃদ্ধির হিসাবটা দেয়া হচ্ছে মূল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার জন্য। এনজিওদের যুক্তি হচ্ছে তাদের নিবিড় তদারকি এবং কার্যাবেক্ষণ এর কারণে তাদের সেবা মূল্য (cost of service) অনেক বেড়ে যায়। ফলে তারা সেটাকে পুষিয়ে নেয়ার জন্য

সুদের হারটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাদের খরচ কত পড়ে সেটা তারা কেউ পরিষ্কারভাবে বলছেন না। কর্মীদের বেতন কত, কত ঘণ্টা তারা কাজ করে, ১০০ টাকা ঋণ দিতে এনজিওদের কত খরচ হয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কত খরচ হয় এই হিসাবগুলি যদি পাশাপাশি দেয়া হয় তবে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতাম। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণটা তারা দিচ্ছে না কেন? সবাই এখন প্রশ্ন উত্থাপন করছে, অতএব এই হিসাবটা তাদের দিতে হবে।

এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রবণতার ইতিহাস হচ্ছে দাতা সংস্থাগুলো যেদিন থেকেই বলছে যে তোমাদেরকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হতে হবে, তখন থেকেই অধিকাংশ এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি করতে গিয়ে তারা দেখলো যে এটা খুবই লাভজনক একটা খাত। এটার লাভ থেকে কর্মীদের বেতন দিয়েও অন্যান্য কিছু কাজও করা যায়। এইভাবে ইনোভেটিভ কিছু ভালো এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছে। সেখানে চলে যাওয়ার পরে এনজিও'র যে চরিত্র সেটার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তারা শুরু করেছে স্বেচ্ছাসেবকমূলক কার্যক্রম দিয়ে। অথচ এখন তারা ব্যবসায়ী। এসব এনজিও'র মালিকরা যে ধরনের জীবন-যাপন করছেন সেটা মোটেই স্বেচ্ছাসেবার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অতএব আমার ধারণা এনজিওগুলোর একটা মৌলিক চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে, যেখানে তারা অর্থ বানানোর বিষয়টিকে একটি প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে কিংবা করতে বাধ্য হয়েছে, হয়তোবা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের নামে। পরবর্তীতে তারা দেখতে পারছে এটা খারাপ নয়।

এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খল করার জন্য অনেকেই একটি রেগুলেটরী বডি তেরী করার কথা বলছেন। এনজিওদের মধ্যেও কেউ কেউ বলছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কথা বলেছি তার আলোকে বলা যায় যে সবকিছুই যেহেতু এই দুর্বৃত্তায়নের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাহলে কে কাকে রেগুলেট করবে? অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটি ইতবাচক পরিবর্তন না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এসব রেগুলেটরী বডি কোনোই কাজ করবে না। এনজিওরা কিন্তু এখন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, যেটা আগে কখনো ছিল না। আমরা এখন তিন ধরণের রাজনীতির ধারণার সাথে সম্পর্কিত এনজিও দেখছি। আওয়ামী এনজিও, জাতীয়তাবাদী এনজিও ও জামাতে ইসলামী এনজিও। এনজিওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চার দলীয় ঐক্যজোটের বর্তমান সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী যে কথা বলছেন তা খুবই কৌশলগত একটি ধারণা। সেখান থেকেই এনজিও সম্পর্কে ইদানিং নতুন নতুন সব কথাবার্তা হচ্ছে। যেসব এনজিও ক্ষমতার বাইরের ঘরানায় রয়েছে এরকম অনেক ছোট ছোট এনজিও সমস্যায় পড়ছে। যে কারণে ইদানিং অনেক এনজিও নন-প্রফিট কোম্পানী এ্যাকট এর অধীনে নিবন্ধিত হচ্ছে। সেই নিবন্ধনের অধীনে কোনো এনজিও'র নির্বাহী কমিটি ইচ্ছা করলেই সরকার বাতিল করতে পারবে না। এনজিওদের মধ্যে আজকে যে বিভক্তি এসেছে এটাও কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই হয়েছে। এই বিভক্তিটা এনজিওদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এইসব বিভক্তির মধ্যেই কিন্তু রেগুলেটরী বডি ইত্যাদি বিষয়গুলো আসছে। এনজিওদের কেউ কেউ বিরোধিতা করছে, কেউ পক্ষে কথা বলছে। দুইটি বিষয় আমি পরিষ্কার করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সেবা করার জন্য এনজিওদের সৃষ্টি। এনজিওরা যদি সেই জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে যায় তাহলে সমাজে তাদের যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল সেটা নষ্ট হবে এবং তার জন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কোনো ধরণের রেগুলেটরী জিনিস এখানে কাজ করবে না। কারণ পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটি এখানে ফেয়ার নয়। সমাজের পুরো প্রক্রিয়াটাই যেখানে অস্বচ্ছ, সেখানে একটি জায়গায় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা যায় না। স্বচ্ছতার নামে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সকল নিয়ম-কানুন ব্যবহার করা হবে শত্রুকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। তাই আমি মনে করি এনজিওরা এখনও শিশু অবস্থায় আছে। তাদেরকে বিকাশের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। এখনই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। এরাতো চুরি-ডাকাতি করছে না। যা কিছু করছে তা সকলের সামনেই করছে। হিসাবের খাতা হয়তো একাধিক থাকতে পারে, যেটা সব ব্যবসায়ীরই থাকে। তবুও তারা কিছু করার চেষ্টা করছে। কেউ যখন কিছুই করছে না। তাদের ইনোভেনগুলো বিকাশের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। আমি লক্ষ্য করছি যে এনজিও'র নেতারা এখন অর্ধেক সময়

ব্যয় করছেন অন্যান্য কাজে। যেমন– রেগুলেটরী বডি কি হবে, এক জনের সঙ্গে অন্যজনের গণ্ডগোল ইত্যাদি কাজে। এটা সময়ের অপচয়। তারা ২০-৩০ বছরে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এখন সময় হচ্ছে এসব অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজে কিছুটা অবদান রাখা। সে জায়গায় তাদেরকে বিভক্ত করা হচ্ছে খুবই সচেতনভাবে। এনজিওরা নিজেরা যদি এটা না বুঝতে পারে তবে অবশ্যই তাদেরকে এর যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। তাদেরকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একত্রিত থাকতে হবে। ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা তারা যদি নিয়ন্ত্রিত হন তাহলে তারা যে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে স্বপ্নের কথা বলেন সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।